দীপেশ চক্রবর্তীর সম্মাননায় ঢাকা থেকে প্রকাশিতব্য একটি সংকলনের জন্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

স্বাধীনতা কারে কয়: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস পাঠের বিড়ম্বনা

নাজমুল সুলতান

১.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে উঠতি বঙ্গের সুধীসমাজে স্বাধীনতার অর্থ নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক গোলযোগ তৈরি হয়েছিল। পাঠক জানেন স্বাধীনতা শব্দটি গাঠনিকভাবে অচিন কিছু নয়—সর্বনাম 'স্ব', 'অধীন' মূল, আর 'তা' প্রত্যয়ের সন্ধিযোগে গঠিত। 'স্বাধীনতা'-র ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, শব্দটি যত চিরপরিচিত বলে মনে হয় আদতে তা না। মধ্যযুগের বাংলায় স্বাধীনতা শব্দের ব্যবহার বিশেষ দেখা যায় না। উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা ভাষায় স্বাধীনতা একটি ধারণা ও শব্দ আকারে বিস্তৃত হতে শুরু করে। ইয়ুরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাজগতের সাথে সাংঘর্ষিক মোলাকাতের পর বঙ্গে যেসব 'ধারণা' হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'লিবার্টি'। 'লিবার্টি'র সেই স্ফুরণ যে বঙ্গের ইয়ুরোপ-সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত ছিল তা নিয়ে সমকালীন ভাবুকেরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে লিবার্টির মোটামুটি বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায় স্বাধীনতা। এই নতুন ধারণার বদৌলতে উনিশ শতকে ভারতবর্ষের গোটা ইতিহাসই নতুন করে পাঠ করার চর্চা শুরু হয়। বাংলা কি কভু স্বাধীন ছিল? স্বাধীনতার মানে কী? এমনতর নানা প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

তবে সেই 'স্বাধীনতা'-ভাব তর্জমা করা বিলাতি আয়নায় দেশি মুখ দেখার মতো সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। উইলিয়াম কেরি সাহেবের বাংলা-ইংরাজি অভিধান এই তর্জমার জটিল ইতিহাস বোঝায় সহায়ক হতে পারে। কেরি সাহেবের অভিধান প্রথম বের হয় ১৮১৫ সনে, পরে আবার ১৮২৫-এ। স্বাধীন ও স্বাধীনতার ইংরাজি অনুবাদ তিনি করেছেন এভাবে: "(from স্ব, self, and অধীন, subject to), independent, subject to one's self." এখানে 'independent' দেখে আমাদের ধরে নেওয়ার কারণ নেই যে তা পরবর্তীকালের সামষ্টিক স্বাধীনতাকে নির্দেশ করছে। খানিক পরেই কেরি সাহেব 'স্বাধীন' মূল চিহ্নিত আরেকটি শব্দ তর্জমা করার চেষ্টা করেছেন: 'স্বাধীনভর্তৃকা' বা 'a woman who is independent of her husband or not under his control'। তার আগে স্বাধিকার সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে: 'a person's own right or title to a thing'। অর্থাৎ স্বাধীনতার আভিধানিক সংজ্ঞা উনিশ শতকের পয়লা সিকিতেও ছিল মোটামুটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। স্বাধীনতা বলতেই আমরা যে রাজনৈতিক—তথা সামষ্টিক—গুণ অনুভব করি তা তখনো অনায়াস হয়নি। যদিও সেই বীজ প্রোথিত ছিল ইংরেজি থেকে বাংলায় করা অভিধানগুলোতে। কেরি সাহেবের বাংলা-ইংরেজি অভিধানের উপর ভর করে জন মার্শম্যানের করা ইংরেজি-বাংলা অভিধানে স্বাধীনতার রাজনৈতিক-সামষ্টিক অর্থ প্রাধান্যশীল। ১৮২৮ সনে প্রকাশিত এই অভিধানে 'লিবার্টি'-র অনুবাদ করা হয়েছে 'মুক্তি, স্বাধীনতা, অনুমতি'। লিবার্টির ছাঁচে 'স্বাধীনতা' সেখানে অর্থময়। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের কারণে বুৎপত্তির প্রভাব সেখানে ভোলা সহজ।

রামকমল সেনের অনূদিত স্যামুয়েল জনসন সাহেবের বিখ্যাত অভিধানের কথা ধরা যাক। প্রকাশিত ১৮৩৪ সনে। সেখানে 'লিবার্টি'-র একগুচ্ছ বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে: 'অনধীনত্ব, স্বাধীনতা, মুক্তি, দাসত্বরাহিত্য, দৌরাত্ম্য।' বিলাতে 'লিবার্টি'-র বিদ্যমান ঋণাত্মক অর্থ (অর্থাৎ কারো অধীন না থাকা) ধরতে গিয়ে স্বাধীনতার আগে অনধীনতাকে বসানোর ব্যাপারটা বোধগম্য। তবে দাসত্ব এবং জুলুমহীনতার উল্লেখ 'লিবার্টি'র রাজনৈতিক-সামষ্টিক অর্থকে ধরতে চাচ্ছে তাও মোটামুটি পরিষ্কার। এই অসম অনুবাদ অন্তত একটা জিনিস পরিষ্কার করে তোলে। বাংলা থেকে স্বাধীনতাকে ইংরাজিতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থ প্রাধান্যশীল ছিল। তার একটা কারণ বুৎপত্তির প্রভাব, আরেকটা সমকালীন বাংলায় স্বাধীনতার সামষ্টিক অর্থের অভাব। ইংরেজি থেকে অনুবাদে 'লিবার্টি'-র বিলাতি ভাব 'স্বাধীনতা'কে আপন চাপে পিষ্ঠ করছিল। আর বিলাতি ভাবে 'লিবার্টি'র প্রাধান্যশীল অর্থ যে রাজনৈতিক ছিল তা বলাই বাহুল্য। যদিও লিবার্টির বাংলা প্রতিশব্দ মুক্তি নাকি স্বাধীনতা নাকি অনধীনত্ব হবে তা নিয়ে তখনো কোনো মতৈক্য তৈরি হয়নি।

নিজের অধীনস্থ হওয়ার ধারণার সাথে রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতার তফাত আমাদের কাছে উনিশ-বিশ মনে হতে পারে। তার কারণ আমরা স্বাধীনতাকে যেভাবে বুঝি তা মূলত বিশ শতকের ফল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'স্বাধীনতা'-র সামষ্টিক মাত্রা অর্জন যে কেবল পূর্বস্থ অর্থের সরল সম্প্রসারণ নয় তা আশা করি এই আলোচনায়ই দেখা যাবে। ইতিহাস কিভাবে অর্থের ডৌল গঠন করে আর অর্থ কিভাবে ইতিহাসের বাঁকাপথকে অলিগলিতে টেনে নিয়ে যায় – স্বাধীনতা নামক ধারণার ইতিহাসে সেই প্রক্রিয়ার কিছুটা সুলুকসন্ধানও আশা করি মিলবে। এইসব প্রশ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের উপনিবেশায়নের ইতিহাস। ঔপনিবেশিক সাক্ষাতের সূত্রে বাংলা তথা ভারতবর্ষ এক হিসাবে 'স্বাধীনতা' হারিয়েছে ও পেয়েছে। ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা'-র জন্ম হয় আপন

মৃত্যুর সংবাদ রটিয়ে – ব্রিটিশ আমল বা মুঘল আমলে বাংলা 'পরাধীন' ছিল কিনা এই প্রশ্ন অর্থময় হয়ে উঠে স্বাধীনতা ধারণার জন্মলগ্নে। আবার 'স্বাধীনতা'র সেই জন্মক্ষণেই তার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বাংলাও স্বাধীনতার নবজন্ম নাকি পুনর্জন্ম হবে সেই তর্কে মশগুল হয়ে ছিল। আমরা যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ওয়ারিশ তাদের জন্যও সম্ভবত স্বাধীনতার স্বাদ বিশেষ পাল্টায়নি। সে যাই হোক।

ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস পাঠের বিড়ম্বনা আমরা শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা-ভাবনার সূত্র ধরে খানিকটা সন্ধান করব। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস পাঠের যতসব সমস্যা আছে বঙ্কিম প্রায়শই তাদের মাঝখানে। এই ছোট্ট প্রবন্ধের পরিসরে এহেন বিশাল সমস্যার তলানি দর্শন না করা গেলেও মোটাদাগের কিছু কথাবার্তা তোলার চেষ্টা থাকবে। বৃহত্তর ভারতবর্ষের চিন্তার ইতিহাসে বঙ্কিমের জায়গা জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ বয়ানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো। এই পাঠ দানা বেঁধে উঠে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে। একাধারে বঙ্কিম হয়ে উঠেন ভারতবর্ষের জাতিচেতনার জনক আবার সাম্প্রদায়িকতার আধার। বলাই বাহুল্য, এই দুই তরফা পাঠই বিশ শতকের ভারতীয় উপনিবেশবিরোধী রাজনীতির কষ্টিপাথরে ঘষে শানানো। দুই পাঠসূত্রই গভীরভাবে উত্তরস্বদেশী যুগের ফল। বঙ্কিম ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার জনক ছিলেন কি না তা নতুন করে নির্ধারণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিমের চিন্তার একটি দিক ধরে এইসব পাঠের অনুমানগুলোকে যাচাই করে দেখাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস আলাদা করে চিহ্নিত করে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র ছোট করে এনেছি বৈকি, তবে তা আলোচনার গভীরতার স্বার্থেই। জগত সংসার থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ আলাদা কিছু নয়, আবার তাকে সমাজের আয়না বলে ভাবাটাও যথার্থ নয়। সাধারণ ঘাত-প্রতিঘাতের তত্ত্ব দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও সমাজ-অর্থনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা চিন্তা ও বাস্তবতা দুইয়েরই অর্থহানি করে। বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস পাঠ করতে গেলে ধারণার সংঘটন, বিন্যাস, তলানি ইত্যাদি আমলে নিতে হয়। (লিখিত) ভাষা ও ভাবের সদা অপূর্ণ সংসারে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের চিরনিবাস। সেই কর্ম কিভাবে সম্পাদন করা যায় তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেবল বিশ্বস্তভাবে বিগত ভাবের পুনর্নির্মাণ করাকে পশ্চিমে কেউ কেউ চিন্তার ইতিহাস লেখার একমাত্র রীতিসিদ্ধ লক্ষ্য ভেবে থাকেন। আমার বিশ্বাস খানিকটা আলাদা। বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস মূলত একটি দার্শনিক প্রকল্প যা চিন্তার সাথে চিন্তার সম্পর্ক পাঠ করে শেষ পর্যন্ত চিন্তারই অবয়ব খোঁজে বেড়ায়। সকল যথার্থ ইতিহাসের মতন বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসও আদতে একটি দার্শনিক অনুশীলন।

২.

'শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি তো স্বাধীন,
ধনুকটা একঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।
ধনু হেসে বলে, শর, জান না সে কথা--
আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা।'

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৩৪, ৮২)

১৮৫৮ সালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মিনী উপাখ্যান* নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তা এখন মোটামুটি বিস্মৃত – বাংলা সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ কলবরে তার জায়গা হয়নি। তবে এই গ্রন্থের চারটি লাইন আজও চাউর: 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,/ কে পরিবে পায়।' রঙ্গলাল এই কাব্যগ্রন্থ লেখায় হাত দেন স্বাধীনতা নিয়ে এক বিতর্কের প্রেক্ষিতে। ১৮৫২ সালে কলকাতার বীটন সভায় এক 'নববাবু' বাঙালির মধ্যে কবিত্বশক্তির অভাব শনাক্ত করেন। রঙ্গলালের সারাংশ থেকেই সেই প্রবন্ধের শাঁস তুলে দিচ্ছি: 'বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই (রঙ্গলাল ১৩৮১, ১৩৭)।' রঙ্গলাল প্রথমত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সেই সভায়ই আরেকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা পরে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামে ছাপা হয়। পশ্চিমা ও বাংলা কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করে রঙ্গলাল স্বাধীনতাধর্ম থেকে কাব্যধর্মকে আলাদা করার নানা শক্তিশালী যুক্তি হাজির করেন। তবে 'প্রতিযোগী' কৈলাসচন্দ্র বসু থেকে রঙ্গলাল পুরোপুরি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। ভারতচন্দ্রে আদিরস প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ধরা যাক: 'সত্য বটে ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় নির্লজ্জতা-প্রতিপাদক আদিরস বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে দোষ ভারতচন্দ্রের নহে। যেখানে তিক্তরসাস্বাদনে লোকের অভিরুচি, সেখানে মিষ্টরসের মধুরত্ব অনুভূত না হওয়াতে তাহা আদৃত হয় না (১৩৮১, ৭৫)। বাংলা কবিতাকে বিলাতি কবিতার সাথে একসারিতে বসাতে না পারলেও কাব্যপ্রতিভার 'বীজের' যে কোনো খামতি নেই সেই ব্যাপারে রঙ্গলাল অটল ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই স্বাধীনতা নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে পরাধীন জাতির কবিত্বহীনতাকে হাতেকলমে ভুল প্রমাণিত করতে উঠেপড়ে লাগেন। কাব্যের বিষয়বস্তু খুঁজতে গিয়ে

রঙ্গলাল জেমস টড সাহেবের *অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুয়িটিজ অব রাজস্থান* গ্রন্থে দ্বারস্থ হন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গাঁথা লেখতে গিয়ে টড সাহেবের কাছে হাত পাতা কেন তা নিয়ে রঙ্গলালের কৈফিয়ত সবিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ:

> 'এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি? – এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐ সকল উপাখ্যানমধ্যে অনেক আলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রুপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেরই ছিল...অতএব স্বদেশী লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসারে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচনা করিলাম (১৩৮১, ১৩৮)।'

এই অনুচ্ছেদে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের কয়েকটা মুখ্য প্রবণতা পরিষ্কার। অনৈতিহাসিক পুরাণের অলৌকিকতা আর টড সাহেব সংকলিত কাহিনির ঐতিহাসিকতার তুলনা বেশ কটকটে। তারপর আরেকটি ব্যঞ্জণাপূর্ণ দাবি: ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের যা কিছু অবশিষ্ট—রঙ্গলালের যুতসই বিশেষণে 'ভগ্নাবশেষ'—তা রাজপুতানা দেশে। স্বাধীনতা ভাবে নতুন হলেও ততদিনে দেখা যাচ্ছে বিষয়ে পুরানো। গল্পটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেয়ে হারানোর আখ্যান—প্রাচীনযুগের সম্পদ তথা স্বাধীনতার আধুনিক বিলুপ্তির করুণ কাহিনি। বাবু বাঙালির ইতিহাস মাত্রই তখন স্বাধীনতা হারানোর ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীনতার ইতিহাস কী বস্তু? রঙ্গলাল এই দাবি আর খোলাসা করেননি। নবযুগের বঙ্গে এই বিবৃতি খোলাসা করার দরকারও হয়ত ছিল না। বাকিটা প্রকাশিত কবিতায়।

রঙ্গলালের 'সোর্স' টড সাহেবের পদ্মিনী আখ্যান মূলত কনক্যুয়েস্ট বা রাজ্যবিজয়ের কাঠামোর ছাঁচে বর্ণিত। আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর বিজয় টড সাহেবের নানা গল্পের একটি। খিলজির চিতোর বাসনার ব্যাখ্যা টড সাহেব করেছিলেন এক বেনামা হিন্দু কবিয়ালের বরাতে: নেহাত রাজ্যবিজয় নয়, পদ্মিনী বিজয়ের বাসনায়ও খিলজি তাড়িত ছিলেন (টড ১৯৭১, ৫৬)। আপন জাতি ইংরেজকুলও যে এই রাজ্যবিজয়ের আদি বাসনায় শরিক তার সরল স্বীকারোক্তি বার কয়েক চলে আসে। টড সাহেবের জন্য সকল রাজ্যবিজয় সমান নয়। রাজ্যবিজয়ের বাসনা ভালো নাকি মন্দ সে নিয়েও সেই বহু আগে থেকে নানাবিধ অভিমত জারি ছিল। কিন্তু এর সাথে প্রজাসাধারণের স্বাধীনতার সম্পর্ক কী এই প্রশ্ন তখনও অর্থময় হয়ে উঠেনি। টড সাহেব যখন চিতোর বিজয়ের কাহিনি লেখছেন তখন রাজ্যবিজয়ের অর্থও পাল্টে যাচ্ছিল। উনিশ শতক থেকে শুরু করে ইংরেজ চিন্তায় উপনিবেশবাদের অর্থ রাজ্যবিজয় থেকে ক্রমে আলাদা হতে থাকে। বিজয়ী-বিজিতের সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেয় ইতিহাসের অগ্রপশ্চাতে অবস্থানের বয়ান। কেবল রাজ্যবিজয়ের যশগৌরব কিংবা বিজিত সমাজ লুঠ করে চলে যাওয়ার মধ্যে তাই আধুনিক উপনিবেশবাদের বিশেষত্ব খোঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই পুরাতন পদ্মিনী কাহিনি রঙ্গলালের উনিশ শতকীয় কল্পনায় নতুন এক মাত্রা গ্রহণ করে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ উলুখাগড়ারও যুদ্ধে পরিণত হয়। আলাউদ্দিন খিলজির জয় শুধু রত্নসিংহ সাম্রাজ্যের পরাজয় নয়, গোটা হিন্দু জনসাধারণের পরাধীনতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। উপরিউক্ত স্বাধীনতাবন্দনার চতুর্পদীখানা চিতোর রাজার মুখনিঃসৃত, সৈন্যসামন্তকে উৎসাহ দেওয়ার প্রেক্ষিতে বলা। রঙ্গলালের বর্ণনায় খিলজি-কর্তৃক রত্নসিংহের পরাজয় হয়ে দাঁড়ায় একাধারে সমগ্র রাজপুত দেশের পরাধীনতা: 'আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে, রাজপুতানার... সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার।/ আত্মনাশে যে করে দেশের উদ্ধার হে,/ দেশের উদ্ধার' (১৩৮১, ১৬৫)। চিতোরের পতন তাই কেবল রাজার পতন হিসাবে থাকল না। হয়ে দাঁড়াল সামষ্টিক পরাধীনতার নামান্তর। রাজ্যবিজয়ের সাথে স্বাধীনতার এই অভিন্নতা ঠাহর করা চিন্তার ইতিহাসে নতুন জিনিস। সতের শতকের হবসেও সার্বভৌম শাসকের পরাজয়ের সাথে প্রজার স্বাধীনতা (তথা লিবার্টির) তফাত দেখা যায়। ফলাফল দাঁড়াল এই যে রাজা বা শাসক স্বজাতির লোক হলে তাকে স্বাধীনতা বলা যায়। পরজাতির হলে পরাধীনতা।

এই সরল ধারণার পেছনে আছে উনিশ শতকের ভারতবর্ষের চিন্তাজগতের নানাবিধ রূপান্তর। তার পুরোটা এখানে ব্যাখ্যা করার অবকাশ হবে না। উনিশ শতকের পয়লা সিকি থেকেই ভারতের উপর ব্রিটিশ অধিকারের নতুন একটা বয়ান দাঁড়ায়। এই নতুন ভাষ্যমতে ভারতবর্ষ পরাধীন কারণ তা এখনো গণতন্ত্রের উপযোগী হয়ে উঠতে

পারেনি, কারণ তার জনসাধারণ এখনো নাগরিকচরিত্র অর্জন করতে পারেনি। রাজ্যবিজয়ের ভাষা অন্তর্হিত হয়। জন্ম নেয় উপনিবেশবাদের নতুন এক ধারণা। দীপেশ চক্রবর্তীর স্মরণীয় রূপক ধরে বলতে গেলে, উপনিবেশকাল হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাসের অপেক্ষাগার। স্বাধীনতা একদিন আসবে, তার আগের যুগে পরাধীনতা, প্রতীক্ষা আর প্রস্তুতি সব একাকার।

৩.

> 'সম্প্রতি স্বাধীনতা-নামক একটি শব্দ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি।'
>
> (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৭ [১২৮১], ৩৬৯)

উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে বঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক পরিসরে স্বাধীনতার ভাব ও ধারণা নিয়ে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। বঙ্গের সেই 'ইতিহাসবুভুক্ষা'-র যুগে স্বাধীনতাচর্চা নানাভাবে প্রকাশিত হয়: কাব্যে স্বাধীনতা বন্দনা, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখার প্রয়াস, পত্রপত্রিকায় স্বাধীনতার চরিত্র বিচার ইত্যাদি। বাবু সমাজের উঠতে-বসতে স্বাধীনতার নাম জপা নিয়ে ব্যঙ্গ দেখা যায় পরিপক্ব বঙ্কিম ও নওল কিশোর রবীন্দ্রনাথ দুইয়ের লেখায়ই। স্বাধীনতা বন্দনা নিয়ে তামাশার মূল দোহাই ছিল বাবুসমাজের ভাসাভাসা স্বাধীনতাদর্শন। বঙ্কিমের লোকরহস্যে এই স্বাধীনতা বন্দনা ও তামাশার রসাত্মক নিদর্শন দেখা যায়। ইংরেজি বুলি ও চালচলনে অনুরক্ত এক 'নব্য বাবু'র সাথে বনবিহারী হনুমানের সাক্ষাত নিয়ে লিখিত 'হনূমদ্বাবুসংবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনমধ্যে হনুমান-কর্তৃক এক বেনামা বাবুর হয়রানির শিকার হওয়া এই লেখার বিষয়বস্তু। কৌতূহলী হনুমানের হাতে (বা লেজে) অপদস্থ হয়ে সেই বাবুর আত্মাভিমানে ঘা লাগে। অতঃপর সেই বন্যপশুকে নবযুগের একটি টোটকা প্রদর্শন করার প্রলোভন তিনি সামলাতে পারেননি। কিন্তু হনুমানকে 'স্থানীয় আত্মশাসন' ও 'স্বাধীনতা'-র সন্দেশ দিতে গিয়ে ইংরেজি কপচানো বাবু উল্টো বেকায়দায় পড়ে যান। ঔপনিবেশিক আমলের সার্বভৌমত্বহীন আত্মশাসনের দার্শনিক ধোঁকাবাজিটা হনুমান মশকরা করতে করতে দেখিয়ে দেয়: 'তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?' (১৩৬১, ৩৬)। কোণঠাসা হয়ে বাবুমশাই অতঃপর স্বাধীনতার সওগাত দিতে যান। তাতে খানিকটা বিরক্ত হয়ে হনুমান বলেন, 'আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?' (৩৬)। হনুমানের বিচারে স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাধীন থাকা। বাবুর করা দাবি – সভ্য মানুষই কেবল স্বাধীন ও সুখী হতে পারে – এক ফুঁতে উড়ে যায়। সভ্যতাবিবর্জিত পশু স্বাধীনতা বুঝবে না এই সান্ত্বনা নিয়ে বাবু ও হনুমান অতঃপর 'কদলী ভোজনে' একাত্ম হন।

বঙ্গের বাতাসে চাউর স্বাধীনতাদর্শন নিয়ে বঙ্কিম যেমন রঙ্গ করেছেন তেমনি নতুন করে স্বাধীনতা-সংজ্ঞায়নের ভিত্তি তৈরি করতেও কলম চালিয়েছেন। লোকরহস্যের সমসাময়িককালেই বঙ্কিম 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামে একখানা প্রবন্ধ রচনা করেন। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের ব্যক্ত অভিপ্রায় ছিল 'প্রাচীন' যুগ ও 'আধুনিক' যুগের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার তুলনামূলক পর্যালোচনা। পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে একই বিষয়কেন্দ্রিক একটি প্রবন্ধ বিখ্যাত: বেঞ্জামাঁ কনস্তাঁর ১৮১৬ সালের De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (প্রাচীনদের স্বাধীনতার সহিত আধুনিকদের স্বাধীনতার তুলনামূলক পর্যালোচনা)। কনস্তাঁর মতোই বঙ্কিমের লেখা ইতিহাসের বেলাবদল নিয়ে ভাবাক্রান্ত। পাছে ভুল বোঝাবুঝি হয়, তাই বলে রাখা দরকার বঙ্কিম কনস্তাঁ পাঠ করেছিলেন এমন কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আর উনিশ শতকে প্রাচীন ও আধুনিকের তুলনা ছিল নিত্যকার ব্যাপার।

প্রবন্ধটি একটু গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যায় বঙ্কিমের স্বাধীনতাভাবনা পরোক্ষভাবে রঙ্গলালকে দেওয়া উত্তর। লেখার গোড়াতেই বঙ্কিম খানিকটা শ্লাঘা সহকারে বলেন, 'বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া... দুইটি কথা শিখিয়াছেন—"Liberty" "Independence" ...অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র (১৩৬১, ২১১)।' এই ধারণার গলদ একাধিক। শাসকের পরিচয় দিয়ে স্বাধীনতা বিচার করতে গেলে উদ্ভট কিছু ফল পাওয়া যায়। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পূর্বপুরুষেরা—যথা প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ—জাতিতে ইংরেজ ছিলেন না। তাই বলে সেকালের বিলাতকে কেউ পরাধীন বলে বিবেচনা করে না। বঙ্কিম তাই শুধান, 'তবে শাহাজাঁদা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?' কদাচ পাঠক এই দাবিকে উপনিবেশ শাসনের পরোক্ষ সমর্থন ভাবতে পারেন তা আন্দাজ করে বঙ্কিম গোড়াতেই ভারতবর্ষের পরতান্ত্রিকতা ঘোষণা করে দেন। বঙ্কিম তাঁর বিকল্প স্বাধীনতা তত্ত্ব পেশ করার আগে

বলে রাখেন স্বাধীনতা (লিবার্টি) ও স্বাতন্ত্র্যের (ইন্ডিপেন্ডেন্স) মধ্যে একটা তফাত আছে। যদি শাসক শাসিত রাজ্যে বসবাস করেন তবে সেই রাজ্য স্বতন্ত্র। শাসকের জাতপরিচয় দিয়ে তাই স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রের ভেদ বিচার সম্ভবপর নয়। স্বাধীনতার বিশেষত্ব তাহলে কী? বঙ্কিমের মতে, 'যেখানে দেশীয় প্রজা এবং রাজ্যের স্বজাতীয় প্রজার ... তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে জাতি পরজাতিনিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন (২১২)।' তাঁর স্বাধীনতাদর্শন যে বিলাতি স্বাধীনতা তত্ত্ব থেকে আলাদা সে ব্যাপারেও বঙ্কিম পরিষ্কার। এই জায়গায় বঙ্কিম যে মিল সাহেবের *অন লিবার্টি* নামক পুস্তকের কথা ভাবছিলেন তা মুখ ফুটে না বললেও আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের স্বাধীনতা বিচারে এহেন স্বাধীনতাদর্শনের ফলাফল যা দাঁড়াল তাতে বঙ্কিমের অসংখ্য অসাবধানী পাঠকেরা চমকে যেতে পারেন বৈকি। প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র হলেও তার ফল যে ষোলআনাই মঙ্গলজনক ছিল এমন নয়। স্বতান্ত্রিক রাজ্যে 'স্বেচ্ছাচারী' কিংবা 'ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রে' নিমজ্জিত রাজার দুঃশাসনের ভার অধিক। বঙ্কিম বিচারে এমন নজির প্রাচীন ভারতবর্ষে কম ছিল না। পরতান্ত্রিক রাজ্যে দোষের পাল্লা অবশ্য কম নয়। বঙ্কিম আরও বলেন, রাজা প্রজা সকলেই স্বজাতির লোক বলে প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জয়জয়কার ছিল এমনটা ভাবার কোনো কারণ নাই। বঙ্কিমের ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করা যাক: 'জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন' (২১২)।

বঙ্কিমের বিশ্লেষণে পরাধীনতার প্রকাশ মূলত দুইভাবে ঘটে। প্রথমত, রাজ্যব্যবস্থা তথা আইন ও শাসনকলের মধ্যে জাতি বা বর্ণগত বৈষম্য জারি থাকে বলে সকলের সমান অধিকার থাকে না। ভারতবর্ষে ইংরেজ ও দেশীয় লোকদের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে বঙ্কিম যার পেশা ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—ভালোই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তা স্বীকার করে নিয়ে বঙ্কিম প্রশ্ন তোলেন, প্রাচীনযুগে ব্রাহ্মণ-কর্তৃক শূদ্রহনন হলে তার আইনি প্রতিকার কেমন ছিল? দ্বিতীয়ত, রাজপদে পরাধীন জাতির বিশেষ জায়গা হয় না। ইংরেজ আমলের রাষ্ট্রযন্ত্রে যেমন বিলাতি লোকের সর্বাধিকার। ভারতবর্ষীয়রা তাতে অল্পবিস্তর জায়গা পেলেও তা নগণ্য। বঙ্কিম তারপর যোগ করেন, তবু নিম্নবর্গ ইংরেজ আমলে যতটুকু সুযোগ পায় তা 'ব্রাহ্মণরাজ্যে ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ।' মোটের উপরে, ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ একাধারে পরতান্ত্রিক ও পরাধীন। প্রাচীন যুগে স্বতন্ত্র হলেও ছিল স্বাধীনতার ঘাটতি। আকবরের আমলে মোটের উপর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এই প্রবন্ধের আরেকটি নেপথ্য বস্তু ছিল সে যুগের চলতি হিতবাদ বা ইউটিলিটারিয়ানিজম। প্রাচীন ভারতের প্রজাবৃন্দ এই যুগের তুলনায় সুখী ছিল এমনটা বলার কোনো অবকাশ বঙ্কিম দেখেন না। তাঁর মীমাংসায়, আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শ্রেণির অবনতি ও 'শূদ্র তথা সাধারণ প্রজার' খানিকটা সুখবৃদ্ধি হয়েছে।

৪.

> 'অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদেরই এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।'
>
> (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১, ২১৪)

বঙ্কিম প্রবন্ধটি শেষ করেন দ্বিধার জানালা সহসা খুলে দিয়ে। স্বাধীনতার ইতিহাস লেখতে গিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় বিভাজনের সাক্ষাৎ পান: ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সামাজিক বিভাজন। স্বজাতির পরিচয় দিয়ে স্বাধীনতা বিচারের ফাঁকি নাহয় বোঝা গেল। তবে কেন এই নৈরাশ্য—বহুদিন পরাধীন থাকার ভবিষ্যদ্বাণী? ইতিহাস ও সমাজবোধের মধ্যে এই জায়গায় এক অলঙ্ঘনীয় দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। সামাজিক নিরিখে বিচার করলে প্রাচীন ভারতে স্বাধীনতা ছিল না। আবার পরাধীন ইংরেজ রাজে নিম্নবর্গের স্বাধীনতা খানিকটা হলেও বেড়েছে। এই বিশ্লেষণের ঐতিহাসিক ফল দুই তরফা। প্রথমত, স্বাধীনতা হারানোর ঐতিহাসিক বয়ান ধোপে ঠিকে না। প্রাচীনযুগ স্বতন্ত্র হলেও স্বাধীন বলা যায় না। তবে কি ইংরেজরাজই উদ্ধারকর্তা? এখানে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক বয়ানের দ্বিতীয় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বঙ্কিমের ব্যাখ্যা কি তবে পরাধীনতার জয়গানই গাচ্ছে না? এমন উপসংহারে পৌঁছানোর কিছু রসদ এই লেখায় থাকলেও খেয়াল রাখতে হবে যে বঙ্কিম ইংরেজ শাসনকে একাধারে পরাধীন ও পরতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজের 'বাঙ্গালা শাসনের কল' নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো আচ্ছন্নতা ছিল না (১৩৬১, ২৮৩-২৮৫)। ঐতিহাসিক ও সামাজিক যুক্তিবিন্যাসের অমিলে আক্রান্ত হয়েই বোধ করি বঙ্কিম 'আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব' বলে ক্ষান্ত দেন। এই লেখার সাথে 'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন' মিলিয়ে পড়লে অনুমান করা যায় যে 'জাতিপ্রতিষ্ঠা'-র জন্য অপেক্ষা করা তথা পরাধীন থাকাই নিয়তি। এখানে 'জাতিপ্রতিষ্ঠা' নেহাত

জাতীয়তাবাদ নয়; সামাজিক ও ঐতিহাসিক স্বাধীনতাবোধের অসামাঞ্জস্য একদিন লাঘব হবে সেই আশার নামও জাতিপ্রতিষ্ঠা বটে।

বঙ্কিম উনিশ শতকের ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের আদি সমঝদারদের একজন ছিলেন। স্বয়ং ইয়ুরোপে সমাজ তথা সোসাইটি বিশ্লেষণাত্মক ক্যাটাগরি হয়ে উঠে আঠারো শতক থেকে। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক সত্তার বাইরে সমাজ নামে যে একটা স্বাধীন বস্তু জারি থাকে তা আধুনিক রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রজাত জ্ঞান। ধনী-গরিব, ক্ষমতাহীন-ক্ষমতাবান এই তফাতগুলোকে নতুন ভাবে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা তৈরি করে এই নব্য সামাজিক জ্ঞানকাণ্ড। এই পথ ধরে বঙ্কিমের হাঁটার সাক্ষী 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' ইত্যাদি। ঐতিহাসিকতাবাদে নিমজ্জিত বঙ্কিমের প্রকাশ ঘটে মূলত তাঁর উপন্যাসগুলোতে, যেখানে ইংরেজপূর্ব মুসলমান শাসনামল নিয়ে তাঁর সঙ্কোচ ফুটে উঠে। মুসলমান-পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থাকে গৌরবান্বিত না করলেও মুসলমান শাসন যে এক ধরনের পশ্চাদমুখী যাত্রা ছিল তা তাঁর সমসাময়িকদের মতো বঙ্কিমেও বিদ্যমান। মুসলমান শাসনামল পশ্চাদপরায়ণ কারণ যে 'বহির্জগতের জ্ঞান'—তথা সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞান—ভারতবর্ষে চিরকাল অনুপস্থিত তার সমাধান সেখানে ছিল না। স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধের সিংহভাগ জুড়ে বঙ্কিম প্রগতিবাদী ইতিহাসের আমন্ত্রণ অস্বীকার করলেও শেষরাগে এই ভাবই প্রাধান্যশীল। বঙ্কিম ইতিহাসের কানাগলি ধরে যেমন হেঁটেছেন (যথা 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার') তেমনি এই নব্য জ্ঞানকাণ্ডের নানারূপ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক চরিত্র নিয়েও ভেবেছেন (যথা *কৃষ্ণচরিত্র*)। বাহুবল বা অন্যান্য জৈববৈশিষ্ট্য দিয়ে ভারতবর্ষের পরাধীনতা ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা করতে গিয়ে বঙ্কিম আবার 'স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাহীনতা'কে হিন্দুচরিত্রের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসাবে দাবি করেছেন ('ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?')।

আমার প্রস্তাবে প্রগতিবাদী ইতিহাসবোধ ও সামাজিকবোধের ভেদ এই পর্যায়ে বঙ্কিম ঘুচাতে পারেননি। দুই পথ ধরেই তিনি হেঁটেছেন আর চলার পথে ফলেছে আলাদা কিসিমের জ্ঞানবৃক্ষ। পরিণত বঙ্কিম আর পড়ন্ত বঙ্কিমের মধ্যকার এই তফাত প্রথম তত্ত্বায়িত করেছিলেন বঙ্গের দর্শনগুরু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আশির দশকের বঙ্কিমের নব্যহিন্দুত্ববাদকে (মূলত ধর্মতত্ত্বের বঙ্কিম) ষাট-সত্তরের বঙ্কিমের বিপরীতে খাড়া করিয়ে শীল বলেছিলেন, যেই বঙ্কিম একদা মুক্তির বার্তাবাহক ছিলেন সেই বঙ্কিমই এখন রক্ষণশীলতার পুরোধা (শীল ১৯০৩ [১৮৯০-৯১], ৮৯-৯৫)। শীলের মতে বঙ্কিমের উল্টোরথে চাপা ছিল নব্যরোমান্টিকতাবাদের অন্তর্গত এক দ্বন্দ্ব। অন্তর্জগত আর বহির্জগত, ভাব আর বাস্তবতার অমীমাংসাজাত নৈরাশ্য থেকে নব্যরোমান্টিক সাহিত্যিক চেতনার জন্ম। সেই চেতনা উনিশ শতক জুড়ে প্রবাহিত ছিল, আর বঙ্কিম তারই এক বিশেষ বঙ্গীয় বহিঃপ্রকাশ। আমাদের আলোচনার সূত্র ধরে বলতে গেলে, নব্যহিন্দুত্ববাদ তথা ধর্মচৈতন্যে ডুব দিয়ে বঙ্কিম ইতিহাস আর সমাজের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমের দার্শনিক পদ্ধতিতে শীল তুষ্ট ছিলেন না। তবে সে অন্য আলাপ। দুই বঙ্কিমের বিপরীত তুলনা দেখা যায় অরবিন্দ ঘোষে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমের যে রাজনৈতিক চিহ্নায়ন হয় তার বিশেষ অনুঘটক অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দের পাঠানুসারে পরিণত বঙ্কিম কেবল ভালো সাহিত্যিক। আর পড়ন্ত বঙ্কিম হলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও জাতিনির্মাতা (২০০২ [১৯০৭], ৩১৬)। তবে অরবিন্দ ও ব্রজেন শীলের পাঠ একই মুদ্রার দুই পিঠ নয়। শীলের বিবেচনায় বঙ্কিমের বাঁকবদল উনিশ শতকের বুক চিরে বয়ে যাওয়া দ্বন্দ্বের ফল। অরবিন্দের পাঠ আবার স্বদেশী আন্দোলনের দমকা হাওয়ায় চাপা। উনিশ শতক সেখানে নতুন এক জাতির আগমনের গল্প। আর বঙ্কিম – যিনি কিনা জাতিনির্মাণের তত্ত্ব দাঁড় করাতে গিয়ে আটকা পড়েছিলেন বিবিধ অন্তর্গত দ্বন্দ্বসংকটে – হয়ে দাঁড়ালেন সেই গল্পের আদিপর্বের নায়ক!

৫.

বঙ্কিমের সাম্প্রতিক কিছু তাফসিরকারও এই দুই বঙ্কিমের ফারাক বিচারে প্রয়াসী হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যান্ড্রু সার্টোরি। সার্টোরির মতে, ষাট-সত্তরের লিবারেল বঙ্কিম পরের দিকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী চৈতন্যে মজে যান। এই ভিতরমুখী টান জগত থেকে প্রত্যাহার নয় বরং অনুশীলনের বলে এক 'indigenous general will' নির্মাণের প্রচেষ্টা (২০০৮, ১৩৫)। সার্টোরির বিচারে বঙ্কিমের এই ভাবপরিবর্তন পুঁজির রূপান্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিফলন। ভাব ও পুঁজির সম্পর্ক এই কায়দায় পাঠে আমার আগ্রহ নেই তবে এই সেই প্রসঙ্গে গিয়ে লক্ষ্যচ্যুত হতে চাই না। এই বিচারের ভিত্তিকে যাচাই করলেই চলবে। পরিণত আর পড়ন্ত বঙ্কিমের ফারাককে 'উদারতাবাদ' বনাম 'আদি জাতীয়তাবাদে' পর্যবসিত করা যে পুরোপুরি যথার্থ নয় তার উদাহরণ দেওয়া যায় আমাদের স্বাধীনতা পাঠের ফিরিস্তি থেকেই। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা'-য় বঙ্কিমের মূল সুর তথাকথিত বিলাতি লিবারেলিজমের সূত্রে গাঁথা নয়। মিল-প্রস্তাবিত স্বাধীনতা বিচারকে বরং তিনি বন্ধনীতে রেখে স্বাধীনতার চরিত্র বিচারে নেমেছিলেন। ইয়ুরোপ বা লিবারেল মতাদর্শ অনুকরণের ফল দাঁড়িয়েছিল পরাধীনতাকে আঁকড়ে ধরা—ইতিহাসের হাতে স্বাধীনতাকে সঁপে দেওয়া। অন্যদিকে প্রাচীনযুগের জয়গান স্বাধীনতার সামাজিক সমস্যা নিবারণে অক্ষম। এই জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় সংকটে উদারতাবাদী লেবেল সাপটিয়ে দেওয়ার বিশেষ কোনো যুক্তি

নেই—পুঁজির বাঁকবদলের সাথে বঙ্কিমের বাঁকবদলকে জোর করে মেলানো ছাড়া। বঙ্কিমের মধ্যে ইতিহাসবাদী আত্মসমর্পণ যা আছে তাও চিন্তার আত্মপীড়নে ভারাক্রান্ত। তাছাড়া ধর্মতত্ত্বের যুগেও অনুশীলনের নামে রাজনৈতিক পরিসরকে আত্তীকৃত করার চেষ্টা বঙ্কিম করেননি। উল্লেখ্য যে পড়ন্ত বঙ্কিমে স্বাধীনতার প্রশ্ন আরেকবার আবির্ভূত হয়েছিল, ধর্মতত্ত্বে গুরু ও শিষ্যের আলাপের এক পর্যায়ে। সেখানে আগের দশকের স্বাধীনতার সংজ্ঞা থেকে বঙ্কিম বিশেষ নড়েননি:

> 'সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।' (১৩৬১, ৫৪৮)

স্বাধীনতার আক্ষরিক সংজ্ঞা না বদলালেও স্বাধীনতা ও ধর্মের মধ্যে সমতান খোঁজার চেষ্টা বঙ্কিমের চিন্তায় নতুন এক মাত্রা বটে। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে বঙ্কিম স্বাতন্ত্র্যকে সিংহাসনকেন্দ্রিক সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনতার অর্থ বোঝাতে পরজাতি নিপীড়নের প্রশ্নকে প্রাধান্য দিতে বলেছিলেন। প্রবন্ধের শেষটা তবু ছিল দ্বিধায় জর্জরিত। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের স্বাধীনতার তুল্যমূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি শরণ নিয়েছিলেন সামাজিক পর্যালোচনা তথা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতার। কিন্তু ভিক্টোরিয়া ভারতে বসত গাড়লেই কি ভারত স্বাধীন হবে? বঙ্কিম সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও *আনন্দমঠে* আরেক গভীরতর সংশয়ের হদিস পাওয়া যায়। আবার সেই *আনন্দমঠই* প্রগতিবাদের বজ্র আঁটুনির মোক্ষম নজির। কুখ্যাত *আনন্দমঠের* সতর্ক পাঠকেরা জানবেন যে অগ্রদূত সন্তানদলের মুসলমান রাজ্যবিজয়ের শেষটা ছিল স্বেচ্ছায় পরাধীনতার বরণের গল্প। স্বাধীনতা ততদিনে বাসা বেঁধেছে ইতিহাসবাদের তল্লাটে। ধর্মতত্ত্ব এক হিসাবে প্রগতিবাদের উভয় সংকট থেকে বের হওয়ার প্রচেষ্টার দলিল। ধর্মতত্ত্বের নিরিখে স্বাধীনতার অর্থ নির্ধারণ করে বঙ্কিম আবার একূল থেকে ওকূলে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে তিনি বিশেষ সার্থক হয়েছিলেন তা বলা যায় না। তবে সকল ব্যর্থতাই নিরর্থক নয়। বঙ্কিমের স্বাধীনতাদর্শন ইতিহাসে মীমাংসিত হয়নি (*আনন্দমঠ*), আর সমাজদর্পণের প্রতিবিম্বও উত্তরের অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ('ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা')। ধর্মতত্ত্ব যতটা না ইতিহাস ও সমাজকে মেলানোর চেষ্টা তার চেয়েও বেশি অন্য এক পাটাতনে পদার্পণের বাসনা। সেই বাসনার ব্যাকরণকে দেশজ জাতীয়তাবাদের নামে বেশিদূর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

পরবর্তীকালের পাঠকেরা নতুন করে বঙ্কিম পাঠ করতে গিয়ে অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। জাতিনির্মাণের প্রগতি-আসক্ত বয়ানের তোড়ে বঙ্কিমের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও জৌলুস ভেসে গেছে। তা দোষের কিছু নয়, পাঠের এই ঐতিহাসিক মাত্রা পরিহার করা মুশকিল। অরবিন্দ ঘোষের পাঠের উদাহরণ একটু আগেই দিয়েছি। সেই পাঠ বিশশতকের অনেকটা জুড়ে রাজত্ব করেছে। বিশ শতকের বঙ্গের রাজনৈতিক ভাবুকেরা বঙ্কিমের পর্যালোচনায় দেখিয়েছেন অপরিসীম আগ্রহ। নিখিল ভারতের দুই রাজনৈতিক দিকপাল—বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশ—বঙ্কিম নিয়ে অনেক লিখেছেন, ভেবেছেন ও বলেছেন। তাঁদের রাজনীতি অনেকটা আলাদা হলেও বঙ্কিম পাঠের সূত্রটা স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ। চিত্তরঞ্জনের মতে ফরাশিদেশে রুসো যেভাবে জাতিসত্তার বীজ রোপণ করেছিলেন তেমনি বঙ্গের প্রেক্ষিতে ছিলেন বঙ্কিম। স্বদেশী আন্দোলনের কালে বঙ্কিমের সাথে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোলাকাতের দিকে ইঙ্গিত করে চিত্তরঞ্জন সেটাকে বঙ্কিমপ্রতিভার 'অপপ্রয়োগ' বলে অভিহিত করেন (১৩৮৪, ১৫৮)।

বঙ্কিমের পাঠক হিসাবে বিপিন পাল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের পরে পরে বঙ্কিম যেভাবে বাংলার মুসলমান পাঠকমহলে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তার অনেক কারণের মধ্যে দুটি হলেন অরবিন্দ ও বিপিন পাল। তাঁদের বঙ্কিমভজনা সরাসরি কোনো মুসলমান বিদ্বেষের প্রকাশ ছিল না তা ধরে নিলেও ফলাফলের দায়টা রয়ে যায়। শেষজীবনে এসে বিপিনচন্দ্র পাল নবযুগের বাংলা নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। এই বইয়ের সর্বাংশে জুড়ে বঙ্কিমের আনাগোনা। ১৯২০-র দশকে বাঙালি মুসলমানরা আবার বঙ্কিমের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি লেখা প্রকাশ করছিলেন। আর্কাইভ ঘাঁটলে দেখা যায় সেটা ছিল ছোটখাটো একটা কুটিরশিল্প। ততদিনে বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের নাম সংক্ষেপে হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাসের এমন পরিণতিতে বিপিন পাল নিজের অবদান নিয়ে খুব সম্ভবত অসচেতন ছিলেন না। সেই দায় থেকেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, বিপিন পালের নিম্নোক্ত কৈফিয়ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ:

> 'মুসলমানকে খাটো করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁহারা বঙ্কিম সাহিত্যের আশ্রয়ে স্বদেশপ্রীতির অনুশীলন করিতেন, তাঁহাদের অন্তরেও মুসলমানের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। লেখক এবং পাঠক – উভয়

> পক্ষই মুসলমান শাসনের বিরোধের স্মৃতি জাগাইয়া বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সত্য বলিতে কি, ভিতরে ভিতরে এই সকল চিত্রে মুসলমান বলিতে আমরা মুসলমানকে বুঝি নাই, যে স্বাধীনতার পরিপন্থী তাহাকেই বুঝিতাম। মুসলমান এই সকল সাহিত্যে একটা ভাবের প্রতীকমাত্র হইয়াছিলেন। এই কথাটা না বুঝিলে বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতির মর্ম্মকথাটা ধরিতে পারা যাইবে না।' (১৯৬৪, ২২৪)

ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস পাঠে এখন সাতচল্লিশের অমোঘ ছায়া মাড়ানো মুশকিল। বিশেষত আমরা যারা নিজেদের সেই ইতিহাসের নিরীহ শিকার হিসাবে দেখি। বঙ্কিম এই যুগান্তরের এক ভুক্তভোগী বটে। বিপিন পালের বঙ্কিমবিচারের এই অংশটুকুর মর্ম অনুধাবন করার রাজনৈতিক প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসের জন্য তার প্রয়োজন আছে। বিপিন পাল এখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন সেটা ঠিক। তবে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না। বঙ্কিমচন্দ্রের (ও তার অনেক সমসাময়িক হিন্দু পাঠকের) স্বাধীনতাদর্শনে ঐতিহাসিক ও সামাজিক যুক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাস আর মুসলমান শাসন এক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার সাথে বিদ্যমান মুসলমান জনসাধারণের সম্পর্কটা কী সেই প্রশ্ন বঙ্কিম বা বিপিন পাল মীমাংসা করতে যাননি। 'কৃষকের কথা' এবং অন্যান্য প্রবন্ধে সমাজস্থিত মুসলমান বঙ্কিমের জন্য কোনো সমস্যা তৈরি করে না। এই জায়গায় হিন্দু মহাসভার সাথে বঙ্কিমের তফাত। কিন্তু বিশ শতকের সমাজকেন্দ্রিক তথা সংখ্যার রাজনীতিতে মুসলমান শাসনের ইতিহাস আর মুসলমান জনসাধারণ এক হয়ে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম পাঠও ক্রমশই ইতিহাসজ্ঞান হারাতে থাকে। বঙ্কিমকে জাতিনির্মাণের আয়না দিয়ে পাঠ করা চলতে থাকে – আর তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায় আরেক পাঠ যেখানে বঙ্কিম হলেন জাতিধ্বংসের নটবর।

৬.

সাবলটার্ন স্টাডিজ বলে জগতে যা রটেছে তার মর্ম আমাদের অনেকের কাছেই সহসা প্রতিভাত বলে মনে হয়। গড়পড়তা ইতিহাসের বয়ানে যাদের কথা চাপা পড়ে যায় তথা নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর উদ্ধার করার পদ্ধতিগত ও তত্ত্বগত অবদানের জন্য সাবলটার্ন স্টাডিজ সাধারণ্যে খ্যাত। এই বোধ অসত্য নয় তবে সাবলটার্ন স্টাডিজের বিশেষত্ব তা আদৌ ধরতে পারে না। বিশ শতকের শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী ইতিহাসশাস্ত্রের যে সাংস্কৃতিক ঝোঁক দেখা যায় সাবলটার্ন স্টাডিজ তার অংশ ছিল। পুরাতন কাঠামোগত – অর্থনৈতিক বা সামাজিক—ইতিহাসের চৌকাঠ পেরিয়ে ইতিহাসের গৌণ চরিত্রদের বয়ান উদ্ধার করবার বাসনা গোটা সাংস্কৃতিক ইতিহাসশাস্ত্রেই দেখা যায়। কিন্তু সাবলটার্ন স্টাডিজ তার ঐতিহাসিক সহোদরদেরকে ছাড়িয়েও গিয়েছিল। আমার বোঝাপড়ায় সাবলটার্ন স্টাডিজের মৌলিক অবদান নিহিত এই মর্মে: ইতিহাসের কালধর্ম আমরা কিভাবে বুঝি তার ফলেও গূঢ়তর একধরনের বৈষম্য ঘটে। সামাজিক বৈষম্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক বৈষম্যের আগাগোড়া ধরা যায় না।

ইতিহাসের অগ্রপশ্চাৎ মাপার পন্থা শুধু যে সামাজিক নিম্নবর্গকে বাদ দেয় এমন না। এইখানে নিম্নবর্গ আদি অর্থে কালিক পশ্চাৎপদ। সামাজিক নিম্নবর্গ তার অংশ, তবে কালিক নিম্নবর্গ তার গূঢ়তর সত্য। দীপেশ চক্রবর্তীর প্রথম বইয়ে তার হদিস পাওয়া যায় (চক্রবর্তী ১৯৮৯)। দ্বিতীয় বই তথা *প্রভিনশিয়ালাইজিং ইয়ুরোপে* এসে সেই কালিক বিন্যাসের দার্শনিক অবয়ব পরিস্ফূটিত হয় (চক্রবর্তী ২০০০)। পশ্চিমা একাডেমিয়া জুড়ে *প্রভিনশিয়ালাইজিং ইয়ুরোপের* প্রভাব অনেক পাঠকই জানবেন। তার একটা কারণ ছিল প্রগতিশীল ইতিহাসবাদের অনতিক্রমণীয় ছায়ায় থেকেও কিভাবে তার বাইরের অভিজ্ঞতাকে ইতিহাসশাস্ত্রের ভাষার অধীনে নিয়ে আসা যায় সেই পথের দিশা দেখানো।

ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস পাঠে ও লেখায় সাবলটার্ন স্টাডিজের মূল অবদানও এই জায়গায়। সাবলটার্ন স্টাডিজের প্রথমদিকের কাজকর্মে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস বিশেষ প্রাধান্য পায়নি তবে তাতে চিন্তার ইতিহাসকে নতুন করে ভাববার নানা খোরাক ছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ দ্রষ্টব্য দীপেশ চক্রবর্তীর যদুনাথগ্রন্থ (চক্রবর্তী ২০১৫)। ভুলসঠিকের দ্বিমাত্রিক ভুবনে আটকে না থেকে বিগত চিন্তার স্থাপত্য বোঝা কেন দরকার তার নজির সেই গ্রন্থ। এমন প্রচেষ্টার ফল যে কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক তা নয়। আমাদের ঐতিহ্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হবে এই প্রশ্নও এখানে প্রাসঙ্গিক। মোটাদাগে ইতিহাসের ভালো ও মন্দ—কিংবা প্রগতিশীল ও পশ্চাৎপদ—যাচাই করে সহজ রাজনৈতিক পরম্পরা বা সিলসিলার আলোতে উদ্ভাসিত হতে চাইলে তাতে রাজনীতি ও আত্মজ্ঞান দুইয়েরই দারিদ্র্য বাড়ে।

বিশ শতকের পাঠের সাথে বঙ্কিমের চিন্তার পূর্বানুমানগত ও যৌক্তিক অসামঞ্জস্যে জোর দিয়ে সেইসব পাঠের সীমাবদ্ধতা দেখানোর চেষ্টা করলাম। বিপিন পালের বঙ্কিমউদযাপন বা বঙ্কিমের মুসলমান সমালোচকদের ভুল দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়।

তা অনেকেই করেছেন বা চাইলেই সহজে করতে পারবেন। বঙ্কিমকে ধরে বরং ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসপাঠের বিশতকোত্তর বিড়ম্বনাকে প্রকাশিত করাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। এই বিড়ম্বনার দুটি মাত্রা। উপনিবেশবিরোধী জাতিনির্মাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঙ্কিমকে পাঠ করলে আমরা তাঁর চিন্তার নিজস্ব ভাষার প্রতি সুবিচার করতে পারি না। বঙ্কিম হয়ে দাঁড়ান জাতির স্রষ্টা অথবা তার আদিপাপ। বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িকতা বাহুল্য এমনও নয়। তবে দেশবিভাগের রাজনীতির ছকে তাঁকে পাঠ করলে সেটা বঙ্কিমের চেয়ে শ্যামাপ্রসাদপাঠই বেশি হয়।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস নতুন করে লেখবার ও ভাববার প্রকল্পে বঙ্কিমচন্দ্র আবারও গোড়াতেই হাজির থাকবেন। সেটা যেমন গেল শতকের অমীমাংসিত মামলার রেশ তেমনি বুনিয়াদি চিন্তারও চরিত্র। তা বারবার ফিরে আসে, সদা অমীমাংসিত।

গ্রন্থসূত্র

আহমদ ছফা, *প্রবন্ধ সমগ্র: তৃতীয় খণ্ড* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৪)

Chakrabarty, Dipesh, *Rethinking Working Class History: Bengal 1890*-1940 (NJ: Princeton University Press, 1989)

- *Provincializing Europe: Post colonial Thought and Historical Difference* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000)
- *The Calling of History: Sir Jadunath Sarkar and His Empire of Truth* (Chicago: University of Chicago Press, 2015)

Ghose, Aurobindo, *Bande Mataram: Political Writings and Speeches 1890-1918* (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 2002)

চিত্তরঞ্জন দাশ, *দেশবন্ধু রচনাসমগ্র* (কলকাতা: তুলি-কলম, ১৩৮৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী: প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১)

- *বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১)

বিপিনচন্দ্র পাল, *নবযুগের বাংলা* (কলকাতা: বিপিনচন্দ্র পাল পরিষদ, ১৯৬৪)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *রঙ্গলাল রচনাবলী* (সম্পাদনা: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি) (কলকাতা: দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স, ১৩৮১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কণিকা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী: সপ্তদশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৭)

Sartori, Andrew, *Bengal in Global Concept History* (Chicago: University of Chicago Press, 2007)

Seal, Brajendranath, *New Essays in Criticism* (Kolkata: Som Brothers, 1903)

Tod, James, *Annals and Antiquities of Rajasthan: vol. i* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1971)